বিশ্ব মাঝে শীর্ষ হব

ড. আহসান হাবীব ইমরোজ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

মানবজীবন : নো দ্যাইসেলফ	**১৫**
মানুষের পরিচয়	১৬
মানবজীবন : সাফল্য ও ব্যর্থতা	১৭
সাফল্য নিয়ে বিতর্ক	১৯
পাশ্চাত্যের বস্তুগত সভ্যতার পরিণতি	১৯

জাতির ভবিষ্যৎ কান্ডারি	**২৬**
আমাদের সোনার খনি	২৭
সমৃদ্ধির জিয়নকাঠি	২৭
আত্মমর্যাদা	২৯
পড়ালেখা আর পড়ালেখা	৩০
কীভাবে স্মরণশক্তি বাড়ানো যায়	৩৩
প্রতিভা : উদ্ভাবন ও উন্নয়নের প্রভা	৩৪
সময় অমূল্য সম্পদ	৩৭
সুন্দর চরিত্র	৩৮

ইউ ক্যান ডু : ভালো রেজাল্ট তোমার হাতে	**৩৯**
হাউসটিউটরের বিশ্বজয় : এক পরিবারেই ছয়টি নোবেল	৩৯
আমাদের অদম্য মেধাবীদের কথা	৪১
সর্বকালের সেরা	৪৯
আইনস্টাইন, হকিংকেও ছাড়িয়ে ১২ বছরের নিকোলা	৫২

ওরা আমাদের হিরো	৫৪
রূপকথার জাদুকর	৫৪
হাত নেই, তবু হাত গুটিয়ে বসে নেই	৫৯
অদম্য দাই গুয়োহং	৬১
পা নেই, তবু বিজয় পদচুম্বন করছেই	৬২
অন্ধ কবিসম্রাট : মিল্টন	৬৩

নো ব্যারিয়ার ইন লাইফ	৬৫
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন	৬৬
রিচ ড্যাড ও পুওর ড্যাড	৬৭
পর্বতকে নয়; বরং নিজেকেই জয় করেছি	৬৮
আকাশের কপাল : মাউন্ট এভারেস্ট	৬৯
বিজয় যেন ভাত-মাছ	৭১

ব্যারিয়ারকে জ্বালিয়ে ক্যারিয়ার	৭৪
সূর্যের রক্তিম আভা	৭৪
নো ব্যারিয়ার ইন লাইফ	৭৬
দরিদ্র কিশোর আজ গ্রেট খালি	৭৮
আলোর ফেরিওয়ালা	৭৮

বিশ্ব মাঝে শীর্ষ হব	৮২
গ্রান্ডফাদার অব মোটিভেশন	৮২
মানবজাতির পিতা : প্রথম বিজ্ঞানী	৮৪
The Most Influential Person in History	৮৪
দ্যা গ্রেটেস্ট ম্যান অন দ্যা ইনিভার্স	৮৫
নবি মুহাম্মাদ ﷺ : সর্বোত্তম আদর্শ	৮৬
তিনি বিশ্বের সর্বোত্তম শিক্ষক	৮৯
তিনি সর্বকালের সর্বোচ্চ সফল নেতা	৮৯
হে মুহাম্মাদ ﷺ : তুমি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম	৯০

এইজ ইজ জাস্ট নাম্বার	৯৩
চার বছরেই বুদ্ধিতে আইনস্টাইনের কাছাকাছি	৯৩
ক্ষুদে ভাষাবিদ	৯৪
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বীর	৯৬
হাউ ডেয়ার ইউ	৯৬
১১০ বছর বয়সি যুবক	৯৮
থিঙ্ক বিগ : মাহাথির	৯৯

একবার না পারিলে দেখ শতবার	১০২
সৃষ্টির সূচনা : সংগ্রাম-সাধনা	১০৩
একটি সহজ ফর্মুলা : Bitter + Batter + Butter = Better	১০৪
একবার না পারিলে দেখ শতবার	১০৬
বিজয়ের ৫০ ও তারুণ্যের অঙ্গীকার	১০৭
এফ আর খান : বিশ্ব মাঝে শীর্ষ এক বাংলাদেশি	১০৯
ভয়ের সাথে যুদ্ধ	১১১

সরল-সঠিক ও সুন্দর পথ	১১৪
ইসলামই সাফল্যের রাজতোরণ	১১৪
মুহাম্মাদ ﷺ : শান্তির শ্রেষ্ঠ মডেল	১১৬
আখিরাতে বিশ্বাস : সর্বকালীন সাফল্যের রক্ষাকবচ	১১৮

মানবজীবন : নো দ্যাইসেলফ

'মানব' ও 'জীবন' ছোট্ট দুটি শব্দ। একটি সত্তা, আরেকটি তার রূপ। একে অপরের সাথে জন্মগতভাবেই আবদ্ধ। যেন মেঘ, বৃষ্টি, প্রদীপ আর আলো। আবার যখন একত্রে বলা হয়—'মানবজীবন', তখন আর সত্তা মানবকে নয়; বরং সমগ্র মানবজীবনকেই বোঝায়। আরেকটি শব্দ হলো 'সাফল্য'। ঠিক এই ক্ষুদ্র শব্দ তিনটিতেই লুক্কায়িত আছে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতকেন্দ্রিক সকল কার্যক্রমের মূলীভূত লক্ষ্য। বাড়ি, গাড়ি, ধন, ডিগ্রি, খ্যাতি অর্জনই মানবজীবনের সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখর—এমনটি মানুষের সাধারণ বিশ্লেষণ। আর তাই বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এগুলো যেকোনো উপায়ে অর্জনের জন্য ভয়াবহ এক ম্যারাথনে লিপ্ত। শুধু কি তা-ই? দুনিয়ার সকল বিভ্রাট, হট্টগোল, মারামারি; এমনকী যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ তার জনকদের ভাষায় এই সাফল্যের উদ্দেশ্যেই ঘটে চলেছে।

আজকে ইরাক, আরাকান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর আর ফিলিস্তিনে হত্যাযজ্ঞ এই তথাকথিত সাফল্যের জন্যই। এমনকী দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের মহানায়করা এই সাফল্য আর শান্তির বাহানাতেই কোটি কোটি নিরীহ মানুষের রক্ত ও লাশের হলিখেলায় মেতে উঠেছিলেন।

তাই 'কীসে সাফল্য?' এই প্রশ্নটি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি অথচ জটিলতম প্রশ্ন। দুনিয়ার লাখো দার্শনিক ও ঋষিদের মাথার চুল পেকে গেছে কেবল এই একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তাই দরকার মানবজীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।

মানুষের পরিচয়

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন— 'নো দ্যাইসেলফ' অর্থাৎ, 'নিজেকে জানো'। দেড় হাজার বছর আগের আরবি প্রবাদেও আছে—'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ, যে নিজেকে চিনতে পারল, সে যেন তার প্রভুকেই চিনতে পারল। এ দেশের লালন ফকিরও বলেছেন—'একবার আপনারে চিনতে পারলে রে, যাবে অচেনারে চেনা।' আমাদের বিদ্রোহী কবি বলেছেন—'আমি চিনেছি নিজেকে সহসা, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' তাই নিজেকে চেনা অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয়।

মানুষের দেহের নিউরো ক্যামিক্যাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দেহ প্রায় ৯৪টি উপাদান দিয়ে গঠিত। সেখানে যে পরিমাণ চর্বি আছে—তা দিয়ে আস্ত একটি কাপড়কাচা সাবান এবং প্রায় ৬ ডজন মোমবাতি তৈরি করা যাবে। যে ফসফরাস আছে, তা দিয়ে ২০ প্যাকেট দিয়াশলাই; যে কার্বন আছে, তা দিয়ে ৯,০০০টি পেন্সিলের শিষ; ৪ গ্রাম লোহা

আছে, যা দিয়ে কিছু আলপিন; যে বিদ্যুৎ আছে, তা দিয়ে ২৫ পাওয়ারের একটি বাল্বকে পাঁচ মিনিট সময় জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষ আছে, যা প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রায় ২০০ প্রকার। এগুলো এতটাই ক্ষুদ্র যে, একটি পিনের মাথায় ১০ লক্ষ কোষ বসতে পারে। প্রতি মিনিটে প্রায় ১০ কোটি সেল মারা যায় এবং সমপরিমাণ তৈরি হয়। আর আমাদের মস্তিষ্কে ১০০ বিলিয়ন ব্রেন কোষ প্রতি সেকেন্ডের হাজার ভাগের একভাগ গতিতে কাজ করতে পারে এবং সেকেন্ডে ৯ কিলো গতিতে বার্তা পাঠাতে পারে।

দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদরা মানুষকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন : ম্যাকিয়াভেলির মতে—'মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী, বদরাগী ও স্বার্থান্বেষী।' প্লেটোর ভাষায়—'মানুষ হলো ডানাবিহীন দ্বিপদ প্রাণী।' ডারউইনের মতে—'বানরের বংশধর।' ফ্রয়েডের মতে—'যৌনতায় উন্মুখ এক জীব।'

আবার কবি নজরুল মানুষকে দেখেছেন সম্ভাবনার আধার হিসেবে—'তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ ও মহীয়ান, জাগো দুর্বার, বিপুল বিরাট অমৃতের সন্তান।'

কবি বেনজির মানুষের মর্যাদা তুলে ধরেছেন এভাবে—'মানুষই আনিল এত ধন মান নিজ হাতে আহরিয়া, পারো কি আনিতে একটি মানুষ নিখিল বিত্ত দিয়া?'

হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে—'মানুষ জন্ম-জন্মান্তরবাদের প্রতিভূ, মনুর সন্তান।' খ্রিষ্টধর্মের মতে—'পৃথিবী এমনকী নিজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, প্রভুর জন্য সন্ন্যাস গ্রহণকারী।' বৌদ্ধধর্মের মতে—'নিজ দেহ হতে নির্বাণ লাভ আকাঙ্ক্ষী প্রাণ।' আর ইসলাম দিয়েছে মানুষের সর্বোত্তম পরিচয় 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা 'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব' এবং স্বয়ং 'প্রভুর প্রতিনিধি বা খলিফা'।[১]

মানবজীবন : সাফল্য ও ব্যর্থতা

বুদ্ধি বা চেতনা আসামাত্রই ছোট্ট শিশুটিও নিজের জীবন সম্পর্কে জানতে চায়। বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের ভাষায়—

'খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে?
কোথায় তুমি কুড়িয়ে পেলে আমারে?'

কিন্তু এর উত্তরটি ঠিক এত সহজ নয়, তাই না?
ফরাসি প্রবাদে আছে—'জীবনের মানে বোঝার আগেই পেরিয়ে যায় অর্ধেক জীবন'। সুবিজ্ঞ ইতিহাসবিদ কার্লাইল বলেছেন—'জীবন হচ্ছে একমাত্র সত্য ইতিহাস।' আরেক প্রবাদে বলা হয়েছে—'তোমার জীবন একটি জাজ্বল্যমান বিরাট গ্রন্থ, যার অক্ষর গুপ্ত তথ্যসমূহে প্রকাশ পায়।'

[১] সূরা বাকরা : ৩০, ফাতির : ৩৯

জীবন সুখে-দুঃখে ভরা। তাই ফরাসি প্রবাদে বলা হয়েছে—'জীবন পিঁয়াজের মতো। কাঁদতে কাঁদতে মানুষ এর খোসা ছড়ায়।' তাহলে সফল জীবন কীভাবে হবে? উত্তর বলেছেন নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল—'একটি ভালো জীবন বলতে এমন জীবনকে বোঝায়, যা ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত।'

আল্লামা ইকবালের ভাষায়—'দৃঢ় বিশ্বাস, অনবরত প্রচেষ্টা এবং বিশ্বজয়ী প্রেম; জীবনযুদ্ধে এই হলো মানুষের হাতিয়ার।'

হাদিসে বলা হয়েছে আরও বিস্তৃতভাবে—'পাঁচটি ঘটনার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনিমত মনে করবে—

১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে,
২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে,
৩. দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে,
৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং
৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।'

কিন্তু সে জীবন গড়তে চাইলে বাধা আসতে পারে পাহাড়ের মতো। তাই তো মহান বীর টিপু সুলতান শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন—*'শিয়ালের মতো* একশো বছর বাঁচার চাইতে সিংহের মতো একদিন বাঁচাও ভালো।' ওমর খৈয়ামের ভাষায়—'দিন কতকের মেয়াদ শুধু, ধার করা এই জীবন মোর/হাস্যমুখে ফেরত দেবো, সময়টুকু হলেই ভোর।'

শুধু 'এলাম আর গেলাম' ধরনের জীবন হলেই তো চলবে না। কিছু দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। হয়তো এই অনুভূতি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।'

কিন্তু সেভাবে নিজেকে গঠন করা কোনো ছোট্ট কাজ নয়। ওমর খৈয়ামের ভাষায়—

'ধূসর মরুর ঊষর বুকে,
বিশাল যদি শহর গড়ো
একটি জীবন সফল করা
তার চাইতে অনেক বড়ো।'

জাতির ভবিষ্যৎ কান্ডারি

প্রতিবছর এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, ফাজিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল বের হলে জাতীয় পত্রিকাগুলো হয় দেখার মতো। এ যেন এক অপরূপ সাজে সজ্জিত গোলাপের সুবিস্তৃত বাগান, তারা ঝলমল আকাশ অথবা মণি-মুক্তো খচিত ময়ূর সিংহাসন।

আমরা বাংলাদেশের এই সম্ভাবনাময় কিশোর-তরুণদের, সকল জ্যোতির্ময় কৃতিদের সর্বদা অভিনন্দন জানাতে চাই। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাতে চাই আষাঢ়ের মুষলধারা বর্ষণের মতো। পৃথিবীর সকল ফুলের সুরভি দিয়ে, পৃথিবীর সকল নদীর কলতান দিয়ে, সকল কোকিলের কুহুতান, বাতাসের সব হিন্দোল, শরতের শিশিরের শুভ্রতা আর তারকার সব তাজাল্লি দিয়ে।

সুপ্রিয় কৃতী গোলাপকলিদের বলি—তোমাদের শুধু অভিনন্দন জানিয়েই কি আমাদের কাজ শেষ? নাহ্! আমি এ রকম এক্কেবারে ভদ্দরলোকটি নই। এর পাশাপাশি আবদার থাকবে কুমিল্লার রসমালাই, বগুড়ার দই, টাঙ্গাইলের চমচম, মুক্তাগাছার মন্ডা, সারা দেশের সব উপাদেয় জিভে পানি আসা মিষ্টি-মিঠাই। বিশেষ করে, তোমাদের নিজের এলাকার মিষ্টির প্রতি থাকল কঠিন আবদার। তবে খুব তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তোমাদের কাছ থেকে একদিন খেয়ে নেব। এই মুহূর্তে সকলের জন্য, বিশেষ করে নবীন কৃতিদের উচ্ছল প্রাণে আর ধীমান মগজে কিছু পরামর্শ রাখতে চাই। গ্রহণ করবে তো পরামর্শগুলো? তাহলে বলেই ফেলি, কেমন!

আমাদের সোনার খনি

গত ২০২১ সালে বংলাদেশে অষ্টম, এসএসসি, দাখিল, ভোকেশনাল ও এইচএসসি, আলিম পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই প্রায় ৫৬ লক্ষ; যারা চাইলে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই বাংলাদেশকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে।

সে হিসেবে অষ্টম থেকে এইচএসসি-আলিম পর্যন্ত এই গ্রুপের মোট সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। পৃথিবীর প্রায় ১৫৮টি সার্বভৌম দেশের প্রতিটির আলাদা জনসংখ্যা এর চাইতে অনেক কম। এ তো গেল শিক্ষার্থীদের কিছু অবস্থানের ধারণা। যদি সমগ্র শিশু-কিশোর-তরুণের কথা ভাবা হয়, তাহলে?

২০২০ সালে ইউএন পপুলেশন প্রোজেকশনের ভাষ্যমতে—১০ থেকে ২৪ বছরের কিশোর-তরুণদের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় ১৮০ কোটি; যা সমগ্র জনসংখ্যার ২৫%।[২] কিন্তু বাংলাদেশে তরুণদের সংখ্যা ৪.৭৬ কোটি; যা মোট জনসংখ্যার ৩০%। তরুণদের সংখ্যায় বাংলাদেশের

[২] *Demographic dividend*, United Nations Population Fund, May 2020.

অবস্থান পৃথিবীতে অষ্টম। এরা আমাদের আপদ নয়; বরং সোনার খনি। যারা মানবসম্পদে পরিণত হলে বাংলাদেশ বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

সমৃদ্ধির জিয়নকাঠি

প্যারাডাইজ লস্টের কবি মিল্টন শিশু-কিশোরদের বিষয়ে বলেছেন—'The childhood shows the man as morning shows the day.' আর কিশোরদের বিষয়টিও আরও মৌলিক। তরুণ কবি সুকান্তের ভাষায়—

'আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।'

তাইতো জাতীয় নেতৃবৃন্দের উচিত শিশু-কিশোরদের নিয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ তো অকাজে মহাব্যস্ত। তাদের সময় কোথায়!

বিশ্বের শ্রেষ্ঠমানব রাসূল ﷺ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেছেন— 'কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম কিছু শিক্ষা দিতে পারে না।' তিনি আরও বলেছেন—'শিশুরা হলো আল্লাহর বাগানের সুগন্ধি ফুল। যে ব্যক্তি ছোটোদের স্নেহ করে না এবং বড়োদের মর্যাদা দেয় না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

নবিজি বলতেন—'ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা।' আনাস (রা.) বলেন— 'আমি নবিজির চাইতে অধিক আর কাউকে সন্তানের প্রতি এমন ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখিনি।' ভারতের বিখ্যাত এ্যানি বেসান্ত লিখেছেন—'রাস্তা দিয়ে যখন মুহাম্মাদ যেতেন, তখন ছেলেমেয়েরা দৌড়ে আসত তাদের দুয়ার থেকে। জড়িয়ে ধরত তাঁর হাঁটু আর হাত।'

নবিজি নিজে এতিম ছিলেন। তাই এতিমদের ভীষণ ভালোবাসতেন এবং বেহেশতেও তাদের দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতা অনেক ব্যস্ততম মানুষ হওয়ার পরও শিশু-কিশোরদের প্রচুর সময় দিতেন এবং তাদের মানোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।

ইতিহাসের বর্ণিল পাতায় আমরা দেখি, নবিজি মাত্র ১২ বছর বয়সে চাচার ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে সিরিয়া সফর করেন এবং ২০ বছর বয়সে হিলফুল ফুজুল গঠন করেন।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে মুহাম্মাদ বিন কাসেম তাঁর জন্মস্থান তায়েফ হতে সাড়ে ৪ হাজার মাইল দূরের সিন্ধু জয় করেন। তাইতো কবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে বলা যায়—'এখন তারুণ্য যার, বিশ্ব গড়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়।'

ওরা আমাদের হিরো

৩১ জানুয়ারি, ২০১৪। রাত সাড়ে আটটা ছুঁইছুঁই। নাকি সুরে নোকিয়া টোন বেজে উঠল। আড়চোখে দেখলাম, স্যামসাং-এর স্ক্রিনে 'রবি'র একটি অচেনা নম্বর। চকিতে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে—'ধরব নাকি ধরব না?' বছর চারেক আগে একবার সাতপাঁচ না ভেবেই একটি অচেনা নম্বর রিসিভও করে বসেছিলাম। ওপার থেকে কণ্ঠটি বলে উঠেছিল—'হ্যালো, আমি জিন বলছি...'

জিনের সাথে সেই মধ্যরাতের মধুর আলাপনের গল্প নাহয় আরেক দিন করা যাবে। আজ শুধু ফোনের কথাই বলি। এবারের কণ্ঠকে বলতে শুনলাম— 'ভাইয়া, কেমন আছেন? আমি মহিউদ্দীন বলছি। একটু পর আমার অনুষ্ঠানটা টিভিতে দেখাবে...' এরপর বিস্মিত চোখে সে অনুষ্ঠান কেবল দেখলাম না; রীতিমতো গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

রূপকথার জাদুকর

কে এই মহিউদ্দীন?

২৯ নভেম্বর, ২০১৩। টিভির সামনে বসা। হাজারো জরিপের ভিড়ে আমজনতার মতামতের এই জরিপটি নজরে আসেনি, কিন্তু নিজের আত্মপর্যালোচনার এক্সরেতে ধরা পড়েছে বারবার। নানা কারণেই মাসে একবারের বেশি বিটিভির সামনে বসা হয় না। কিন্তু একবার যে কারণে বসতে হয়, সেটি কোন দিন? সেটি হচ্ছে—'ইত্যাদি' অনুষ্ঠান। সাধারণত মানুষ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বলে বা লিখে সবশেষে আর বিরক্তি না বাড়াতে যোগ করে 'ইত্যাদি'। অথচ মজার বিষয় হলো—বিটিভির এক নম্বর অনুষ্ঠানের নাম 'ইত্যাদি'। হা.হা.হা...

গত ২৯ নভেম্বর, প্রিয় ইত্যাদি; যথারীতি নিয়মিত মানবিক রিপোর্টের মতো সেদিনও চট্টগ্রামের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন শরীফ আর লক্ষ্মীপুরের মহিউদ্দীনকে দেখাল। শরীফের গল্প নাহয় আরেক দিন বলব, এবার মহিউদ্দীনেরটা বলি। গল্পটা কি আমিই বলব, নাকি তার থেকেই শুনবে, বন্ধুরা?

৩০ বছরের এই সংগ্রামী মহিউদ্দীন আমাদের উজ্জীবিত করার জন্য আমাকে মেইল করে পাঠিয়েছেন নিজের সংগ্রামের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল কাহিনি। এসো বরং সেটাই আগে পড়া যাক—

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মো. মহিউদ্দিন, জন্ম : ১০ই জানুয়ারি, ১৯৮৩ইং। পিতা : মৃত লেদু মিয়া, গ্রাম : গৌরি নগর, পো : লক্ষ্মীপুর, উপজেলা : সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর। চার ভাই দুই বোনের সংসারে সবার ছোটো

আমি। মায়ের কোল থেকে মাটিতে চলা শুরু করতে না করতেই বাবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। দীর্ঘ ৮ মাস চিকিৎসার পর মাত্র চার বছর বয়সে বাবার আদর-সোহাগ আর শাসন বোঝার আগেই মারা যান তিনি।

ছোটো ছোটো ছয়টি সন্তান নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মহিলা হন আমার মা। বাবার অবর্তমানে ছয় ভাই-বোনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিবারে ধীরে ধীরে আমার বেড়ে ওঠা। বাবাহারা সংসারে দুই-বোনের বিয়ের পর ভাইয়েরা বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। নানাবিধ প্রতিকূলতা আর শত অভাব-অনটনের সাথে সংগ্রাম করে S.S.C পাশ করে আর সামনে এগোনো সম্ভব হয়নি। ভাইদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে দিশেহারা হয়ে যাই আমি। চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর।

নিজেকে কুসংস্কার ও দরিদ্রতামুক্ত করার আগেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামে করলাম বিয়ে। হতাশা যেন আমাকে আরেকটু চেপে বসল। নিজের যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করি। অবশেষে পল্লিবিদ্যুৎ সমিতিতে লাইনম্যানের চাকরির মাধ্যমে হতাশা আর অন্ধকার দূরীভূত হতে শুরু করল। বেশ ভালোই চলছে চাকরিজীবন। মা আর স্ত্রীকে নিয়ে সংসারজীবন। এরই মাঝে আমার স্ত্রীর কোলজুড়ে এলো আমাদের প্রথম সন্তান (মাহি রহমান মোহনা)।

না, সুখ বেশিদিন টেকেনি। মাত্র এক বছর চার মাস চাকরি করার পর হঠাৎ করে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শক লাগে আমার। আমি আমার নিরাপত্তা বেল্টে ঝুলে যাই। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় খুঁটি থেকে নামিয়ে আমাকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক আমাকে ঢাকা মেডিকেলে প্রেরণের পরামর্শ দেন। আমাকে মাদারীপুর থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। চিকিৎসার চতুর্থ দিনে ডাক্তার আমার হাত ও পাগুলো কেটে ফেলার কথা বলেন।

আমি অপারেশনে মত না দেওয়ায় তারা আমাকে সেখান থেকে রিলিজ করতে বাধ্য হন। আর আমি আত্মীয়স্বজনদের সহায়তায় আমার নিজ জেলা লক্ষ্মীপুরে চলে আসি। এখানে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে আমার দীর্ঘ চিকিৎসার পর হাত ও পাগুলো কেটে ফেলতে হয়। আমি দেখেছিলাম—মাদারীপুর সদর, ঢাকা মেডিকেল, লক্ষ্মীপুর সিটি হসপিটালে কীভাবে শরীরের রক্ত-মাংস-হাড় মিলে কিছু অংশ আমার কাছ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল!

চলে গিয়েছিল আমার চাকরিটাও। সেইসাথে গার্ডিয়ানদের চাপে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল আমার স্ত্রীও। সবকিছু হারিয়ে আমার কী অবস্থা হয়েছিল—তা অন্য কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। এভাবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলে গেল এক বছর সময়। আমার হাত-পায়ের ক্ষতগুলো সেরে উঠল। নতুন করে বাঁচার আশায় আমি দুটি কৃত্রিম পা সংযোজন করলাম, যেগুলো আমাকে গৃহবন্দি থেকে মুক্তি দেয়। আমি কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে হাঁটাচলা করতে পারি।

ইতোমধ্যে আমি হাতের অবশিষ্টাংশ দিয়ে লিখতে ও মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার অপারেট করতে শিখেছি। এক বড়ো ভাইয়ের সহযোগিতায় গ্রামীণ ব্যাংকের নিকট থেকে একটি আইএসডি

ফোন নিয়ে স্থানীয় একটি জংশনে কল বিক্রি শুরু করি। শুরু হয় নতুন করে বাঁচার চেষ্টা। কিছুদিন পর আমার এক শিক্ষকের মাধ্যমে আমার পাশে এসে দাঁড়াল আমার স্ত্রী। যদিও আমার উপার্জনে সংসার চলছিল না, তবুও সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়নি।

সময় পার হয়ে যাচ্ছে তার আপন গতিতে। এর মাঝে আমি স্থানীয় একটি সংস্থা থেকে পল্লি চিকিৎসার ট্রেনিং শেষে দোকানে ওষুধ বিক্রি শুরু করি। এবার কোনো রকমে চলছে আমার সংসার। মা, বড়ো ভাই-বোন এবং অন্যরা আমার প্রতি অনেক সন্তুষ্ট। জীবনের এমন বিপর্যয়ের পর অনেক বাধা-বিপত্তি আর সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি।

আর আমার এ সফলতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে জনাব হানিফ সংকেত স্যার গত ২৯শে নভেম্বর, ১৩ ইং-এ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে আমার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রচার করেন; যা অনেকেই দেখেছেন। হানিফ সংকেত স্যার এবং 'ইত্যাদি'র বদৌলতে পল্লিবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ আমাকে চাকরিতে পুনর্বহালের ব্যবস্থা করে। সেই সুবাদে বর্তমানে আমি লক্ষ্মীপুর পল্লিবিদ্যুৎ সমিতির একজন কর্মচারী হিসেবে কাজ করছি।

মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে খুব সুখে জীবনযাপন করছি। আপনার সবাই আমার জন্য দুআ করবেন।

মো. মহিউদ্দিন
সদর, লক্ষ্মীপুর।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। পিচগলা রোদে দাঁড়িয়ে আছি লক্ষ্মীপুর জেলা সদরের জকসিন বাজারে। শোনা যায়, ব্রিটিশ আমলেরও আগে এখানে জ্যাকসন নামক এক ইউরোপিয়ান থাকত। তার নাম ভেঙে হয়েছে এ নাম। যেমন—মি. কক্স-এর নামে কক্সবাজার।

কালো বাটা জুতার সুখতলি ভেদ করে লাগছে পিচের উত্তাপ। পা'যুগল কিছুটা ডিঙি মার্কা হওয়াতে এমনিতেই জুতা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে পেলেও আমার হাঁটাহাঁটির তোড়ে ওদের প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। মুখ থাকলে ওরা (মানে জুতার কথা বলছি) আলবৎ চিৎকার দিত—'ছেড়ে দে বাবা কেঁদে বাঁচি।'

দু-পাটির তলা দুটিই ক্র্যাক (একটু ভিন্ন ভাষায় বললাম, না বুঝলেও চলবে) হয়ে গেছে। এয়ার কন্ডিশন তো বটেই; বরং বলা যায় ওয়াটার কন্ডিশন। রাস্তায় একটু কাদা-পানি থাকলে আলবৎ সেই ক্র্যাক গলিয়ে মোজার সাথে মাখামাখি করতে পারে। তাতে লাভ শৈশবের সোনা ঝরা দিনগুলোর কাদা-পানির সেই অকৃত্রিম ছোঁয়া পেলেও বারবার অজু করতে হয়, এই যা।

ব্যারিয়ারকে জ্বালিয়ে ক্যারিয়ার

গত ৭০ বছরে (১৯৫৩-২০২২) প্রায় ৪,০০০ মানুষ এভারেস্টের শীর্ষে উঠেছে। মানে পৃথিবীর প্রতি ২০ লাখ মানুষের ভেতর মাত্র একজন উঠেছে। মারা গেছে প্রায় ২৬০ জন। জনপ্রতি আরোহণে খরচ বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে আমাদের কয়জনের পক্ষে এটি সম্ভব?

হিলারি এভারেস্ট বিজয়ের পরেও প্রায় ৫৫ বছর (২০০৮) বেঁচে ছিলেন। তিনি ৮৯ বছররের দীর্ঘ জীবনে পৃথিবীর সব দুর্গম এলাকা চষে বেড়িয়ে অন্তিম অভিজ্ঞতায় বলেছিলেন অনেক দামি কথা। এর মধ্যে সবচেয়ে দামি মনে হয়েছে এই কথাটি—এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার চাইতেও মানুষের জীবন অনেক অনেক বেশি মূল্যবান।

আমরা সচেতন মানুষরা কি পারি না, নিজের এই মহামূল্যবান জীবন গঠনের সুনিপুণ পরিকল্পনা ও সাধনা করতে? এবার এই সত্যের হিমালয়ের পাথরে রক্তের কালিতে আঁকা কয়েকটি গল্প দেখলে কেমন হয়?

সূর্যের রক্তিম আভা

অরুনিমা সিনহা। এ নামের অর্থ 'প্রভাত সূর্যের রক্তিম আভা'। ভারতের লক্ষ্ণৌ শহর থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটি জেলায় ১৯৮৮ সালে তার জন্ম। মাত্র তিন বছর বয়সে সে আর্মি অফিসার পিতাকে হারায়। অদম্য মেয়েটি চাকরির জন্য ট্রেনে দিল্লি যাওয়ার পথে ট্রেনের কামরায় ডাকাতদের মুখোমুখি হয়। ওরা তার মায়ের দেওয়া স্বর্ণের চেইনটি ছিনিয়ে নিতে চায়। মাত্র ২৩ বছরের একজন মেয়ে হয়েও সে রুখে দাঁড়ায়।

কিন্তু ওরা সংখ্যায় ছিল প্রায় ১০ জন। একযোগে তাকে চেপে ধরে। কামরাভর্তি লোক ছিল, কিন্তু মানুষ ছিল না একজনও। সবাই যেন তামাশা দেখছে। ডাকাতরা কয়েকজন তার হাত-পা ধরে শূন্য করে পাশের ট্রেনলাইনে ছুড়ে দেয়। উলটো দিক থেকে একটি ট্রেন ধেয়ে আসছিল। নিজেকে কোনোমতে সরাতে পারলেও বাম পা'টি লাইনে আটকে যায়। ট্রেনের চাকায় সেটি পিষ্ট হয়। এরপর সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

উদ্ধার শেষে চার্ট থেকে জানা যায়, তার পায়ের ওপর দিয়ে ৪৯টি ট্রেন চলে গেছে। জ্ঞান ফিরলে সে বুঝতে পারে, রাতে সেই জনশূন্য জঙ্গলা এলাকার হিংস্র প্রাণীরা আসছে তার গরম রক্তের স্বাদ নিতে। একেকটি ট্রেন এলে আবার প্রাণীরা পালায়। এভাবে সকাল হলে গ্রামের মানুষরা তাকে হসপিটালে পাঠায়।

গ্যাংগ্রিন থেকে বাঁচতে ঝুলে থাকা পা'টিকে সার্জন কেটে ফেলে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নানা বিড়ম্বনা; এমনকী পুলিশের পক্ষ থেকে উলটো তার বিরুদ্ধে আত্মহত্যার অভিযোগ আনা হয়! ক্ষোভে ফেটে পড়ে তার অন্তরাত্মা। একেবারে ভেঙে যাওয়া কিংবা আত্মহত্যা ছাড়া সে কোনো পথ দেখছিল না। হঠাৎ ঐশী আবেগে ভরে যায় মন। আর্মি অফিসার বাবার কথা মনে হয়। বেডে শুয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সিদ্ধান্ত নেয়, সে দেখিয়ে দেবে সবাইকে। কিন্তু কীভাবে?

বেডে শুয়েই নিয়ে ফেলে এভারেস্টের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওঠার সিদ্ধান্ত। নিশ্চয়ই তখন সবার টনক নড়বে। অতঃপর তার মুখেই শোনা যাক বাকিটুকু—'আমি ডাক্তারদের সাথে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলাপ করলে কেউ হাসে আর কেউ ভাবে, আমার মেন্টাল সমস্যা হয়েছে। কিন্তু ভেতরের ইচ্ছাশক্তির আগুন আমার দাউদাউ করে জ্বলছে। সাধারণত কর্তিত পায়ের মানুষদের আবারও হাঁটতে কয়েক মাস সময় লাগে; কিন্তু সেটি আমি দুই দিনেই শুরু করি।'

এই সংগ্রামী সময়ে তার পাশে ছিলেন ভারতের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নারী বাসেন্দরি পাল। তিনি দৃঢ়তার সাথে তাকে বলেছিলেন—'Arunima, in this condition you made such a huge decision. Know that you have already conquered your inner Everest. Now you need to climb the mountain only to show the world what you are made of.'

'সেদিনটি ছিল ২১শে মে, ২০১৩। হিলারি ও তেনজিং-এর বিজয়ের ৬০ বছর পূর্তি হতে মাত্র আট দিন বাকি। সঙ্গী শেরপা হুঁশিয়ার করছে—"তোমার অক্সিজেন শেষ হতে চলেছে। আগে নিজেকে রক্ষা করো। তুমি আবারও আসতে পারবে।" কিন্তু আমি তখন নাছোরবান্দা। শৃঙ্গে উঠে ছবি তুলে যখন নামছি, মাত্র ৫০ পদক্ষেপ নিচে নামতেই অক্সিজেন শেষ। শেষাবধি শেরপার অতিরিক্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে সে যাত্রায় বেঁচে যাই।' বলছিল অরুনিমা।